ভূমিকা

সম্প্রতি নারীবাদী সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও এর বীজ রোপিত হয়েছিল সুদূর অতীতে। পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় নারীর অধিকার হয়ে পড়েছিল সঙ্কুচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তুলনামূলক বিচারে পুরুষের অবস্থানের চেয়ে নারীর অবস্থান ছিলো অনেকটাই নগণ্য। মার্কসবাদী চিন্তায় নারীভাবনার এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। একে একে ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও নারীর অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

এদেশের নারীরা ব্রাহ্মণ্য শাসনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনগুলি নারী প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি নারীরা কোনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। তাদের ইতিহাস ছিল মূলত লাঞ্ছনার ইতিহাস। তারা ছিল পুরুষদের ভোগ্য সম্পত্তির একটা অংশমাত্র। এই নারীরা ছিল অজ্ঞ, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ঘোমটা বন্দী ও বোরখা পরিহিতা। নারীরা ছিলো জন্তুর মতো, নিজেদের অনুভূতিকে প্রকাশ করবার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। সতীদাহ প্রথা, পুনঃবিবাহরোধ, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বাধা, পণপ্রথা — এই দুষ্ট ক্ষতগুলি নারীর অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্তের কথা স্মরণীয় —

"আমি স্বপ্নদেখি নতুন নারীর।
নতুন এক ভেনাসের,
যে লক্ষ লক্ষ ডুবে যাওয়া মেয়ের সম্মিলিত শক্তির পুঁজি নিয়ে উঠে আসবে।
পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করবে চোরাবালির দুরভিসন্ধি।"

লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে জন্মগ্রহণ করে নারীরা বুঝতে পেরেছে তাদের নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, তাদের দেহটাই সম্বল। তারা সন্তান ধারণ করে, তাদের লালন পালন করে। এইরকম গতানুগতিক জীবনধারায় তারা অভ্যস্ত। অথচ নারী সমাজ বহির্ভূত অংশ নয়। তাদের আত্মিক মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ মন, সমৃদ্ধ চেতনা, স্বতঃস্ফূর্ততা সবই সহজাত। তবেই তো নারী শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটবে। কাজেই নারী ও পুরুষের সমতা এবং উভয়ের সম্মিলিত অখন্ড রূপ একমাত্র কাম্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজনে লেখনী ধারণ করেছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার,

রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও এবং পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নারী মুক্তির বিষয়গুলি নারী সমাজকে সচেতন করে তোলে। বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, বেঙ্গল স্পেকটেটর, সর্বশুভকরী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলির লক্ষ্য ছিল মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধন। তারই ফলস্বরূপ কৈলাশবাসিনী দেবী তাহেরন্নেসা, সৌদামিনী দেবী, মধুমতী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকামিনী, কামিনীসুন্দরী প্রমুখ নারী ব্যক্তিত্ব লেখনী ধারণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দিতে নারীমুক্তির আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। Womans Indian Association, All India womans conference প্রভৃতি দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৮ই মার্চ ১৯১৩ সাল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি পায়। এইরকম কোনো বিশেষ দিবস কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নেই। সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থান সম্পর্কে মনের মধ্যে আলোড়ন ওঠে এই দিনটির প্রেক্ষিতে। নারীকে বলা হয় অর্ধমানুষ।

অথচ স্বাধীনতার ৬৪ বৎসর পরও নারী পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। যে দেশে রাষ্ট্রপতি একজন নারী, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে দেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকার থাকলেও জন্মের আগেই মৃত্যু পরোয়ানা নেমে আসে কন্যাভ্রূণের উপর। তিনমাসের শিশুকন্যা আফরিন ব্যাঙ্গালোরে বেসরকারী হাসপাতালে মারা যায় পিতার অত্যাচারে শুধুমাত্র কন্যা হওয়ার অপরাধে। ২০১০ সালের জনগণনা অনুসারে প্রতি হাজারে পুরুষ ৫১৭ ও নারী ৪৮৩ অর্থাৎ পুরুষ প্রতি নারী কম। পণপ্রথা নামক সামাজিক ব্যাধির কারণে গৃহবধূ হত্যা থেকে রেহাই পায়না এ যুগের নারীরাও। ২০১০ সালে গৃহবধূ হত্যার পরিসংখ্যান ৮৩৯১। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের নিচে। বাল্যবিবাহ একটা সামাজিক সমস্যা। বাল্যবিবাহ বন্ধের আইন আছে কিন্তু সেই আইনের বাণী অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর কাছে পৌঁছায় না। আবার আমারা দেখতে পাই এই নিম্নশ্রেণীর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরাই বাল্য বিবাহ বন্ধে প্রতিবাদ করছে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কয়েক জনকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃতও করেছেন। এ যুগেও মেয়েরা যে কতটা অসহায়, অরক্ষিত তা আমরা দেখতে পাই ৫ই ফেব্রুয়ারী পার্কস্ট্রীটে একজন মহিলা নাইটক্লাব থেকে বাড়ী ফেরার পথে ধর্ষিত হন। বর্ধমানের কেতুগ্রামে কাটোয়া আহমেদপুর ন্যারো গেজ লাইনের ট্রেন থেকে নামিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী একজন মহিলাকে ধর্ষণ করে। বরানগরে কাগজ কুড়ুনিকে গণধর্ষণের পর নিবেদিতা সেতুতে ফেলে পালায়। যখন অধিকাংশের অভিমত আদৌ কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি বা প্রমাণ মেলেনি। সেই সময় এই দুই নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হলেও প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি। প্রশাসন বা আইন তাদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

সভ্য সমাজও মেয়েদের সহজে স্বীকৃতি দিতে চায় না। আমরা দেখতে পাই প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজের বিলেত ফেরত শিক্ষক বরাবরই কাদম্বিনীর বিপক্ষে ছিলেন। তাকে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করান নি। সেই কারণে এম. বি. পড়ার পরিবর্তে সেনেট 'লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি' পড়ার অনুমতি দিল। দুই বছর পর ফাইনাল পরীক্ষায় আবারও একজন পরীক্ষক তাকে ফেল করালেন, পুনর্মূল্যায়ন হলেও পাশ করালেন না।

তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. কোটস তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাদম্বিনীকে 'গ্রাজুয়েট অব দ্য মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল' উপাধি দিলেন। কাদম্বিনীকে ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করার লাইসেন্স দিলেন। ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করায় মেডিকেল কলেজে তার চাকরিও হয়েছিল এই উপাধির ভিত্তিতে। কাদম্বিনী দেবীর তিন দশক আগে ইংরেজ মেয়ে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ইউরোপে কোথাও মেডিকেল পড়তে না পেয়ে আমেরিকার একটা অখ্যাত কলেজে থেকে পাশ করেন। এলিজাবেথ আন্ডারসন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা ডাক্তার কিন্তু কোনো কলেজ তাকে ক্লাস করতে দেয়নি। প্রাইভেট পড়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন। ছাত্রদের সঙ্গে একই পরীক্ষা দিলেও এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়েরা পেতেন সার্টিফিকেট, ছেলেরা পেতেন ডিগ্রি। এই সার্টিফিকেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন জুটত না। কাদম্বিনীর আগে চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত ছিল, তার খাতায় নম্বর দেওয়া হলেও উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম উঠবে না, পাশ করেও তাই সার্টিফিকেট পাননি চন্দ্রমুখী।

নারীদের সামাজিক অবস্থান পুরুষের থেকে অনেক স্বতন্ত্র হলেও একে একে তারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। যদিও প্রথম দিকে তাদের আত্মপ্রকাশ পুরুষের সহায়তায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পুরুষ তার স্বামী, পিতা এবং অন্য কোনো পুরুষ। এই সমস্ত অন্তঃপুরিকারা যখন কলম ধরলেন তা প্রায় লুকিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই স্বামীরা সাহস জুগিয়েছেন আবার কোথাও বিরুদ্ধতা। তবুও এর মধ্যেই চলেছে সাহিত্য চর্চা। এ সমস্ত লেখিকাদের বেশিরভাগই সাধারণ গল্প বা আত্মজীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু এই সব গল্পের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও যে প্রতিবাদ ধরা পড়েছে এটাই যেন মনে হয়েছে, লেখিকার মনের কথা।

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। সমাজজীবনের কথা কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রহসনে ও প্রবন্ধে লেখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল ছোটগল্পে সমাজের কথা আরো সার্থকভাবে তুলে ধরা যায়। সাহিত্যের এই জনপ্রিয় শাখাটির সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রাক্ রবীন্দ্র যুগেও এর উপাদান বহু লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিয়ে এই শাখার আরো সমৃদ্ধি ঘটেছে। যুগে যুগে সমাজসচেতন গল্পকারগণ সমাজের কথা বলতে গিয়ে সমাজ জীবনের অসঙ্গতি গুলো তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি প্রতিবাদী চেতনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ধারা প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই ধারা পথেই বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী লেখিকাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তারা প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা দিয়েছেন এবং জনসমক্ষে প্রতিবাদী চেতনাকে সাহিত্যের অঙ্গনে এনেছেন।

আমার গবেষণার বিষয় 'প্রতিবাদী চেতনার আলোকে বাংলা মহিলা গল্পকার (একশ বছরের সময়সীমায়)' একশ' বছরের সময়সীমায় বলতে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন পর্যন্ত সময়সীমাকে আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছি। এই সময়কার মহিলা গল্পকারদের গল্পের প্রতিবাদ দেখানোই আমার মূল প্রতিপাদ্য। একারণে আমি আমার গবেষণা কর্মকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এজন্য প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বিশিষ্ট ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এসেছে মহিলা গল্পকারদের প্রসঙ্গ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরসীবালা দেবী প্রমুখ স্বাধীনতা উত্তর পর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা গল্পকাররা হলেন পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সাবিত্রী রায়, ছবি বসু, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন প্রমুখ। বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁদের গল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আমি শুধু নির্বাচিত প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পগুলিরই উল্লেখ করেছি। সেজন্যই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বারে বারে ছোটগল্পের কথা উঠে এলেও আমরা বিশেষভাবে গল্পকেই ব্যবহার করতে চেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিলা গল্পকারদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রকৃত পরিচয় এবং তাদের গল্পসৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণার বিষয়টি আলোচনায় এনেছি। তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণারূপে দেশ, কাল ও সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি কোন কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে সে তথ্য তুলে ধরতে ভুলে যাই নি।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে তৎকালীন সমাজ সমস্যা এবং সংকটের বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। লেখিকারা সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নির্দেশ দিয়ে থাকলে, সেই নির্দেশিকা ব্যক্ত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত মহিলাগল্পকারদের গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের সঙ্গে আঙ্গিক নৈপুণ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি, আয়তন, নামকরণের সার্থকতা, গল্পকথনরীতি, বর্ণনা নৈপুণ্য, নাটকীয়তা, কাব্যগুণ, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ইতিহাস চেতনা, পুরাণ চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, রূপ বিশ্লেষণ, উপমা, চিত্রকল্প, সংলাপ নৈপুণ্য, সময় বিন্যাস, দেশী-বিদেশী শব্দের

ব্যবহার ও খন্ডের মধ্যে সমগ্রের প্রতীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে গল্পগুলির শিল্পরূপ ও আঙ্গিক বিচার এবং মহিলা গল্পকারদের গল্পে আঙ্গিক পরিবর্তন কতটা ঘটেছে সে বিষয়টি তুলে ধরেছি।

আমার গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে তুলনার আলোকে মহিলা গল্পকারদের কথা। তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়েই গল্পকারদের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। আমার গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুবোধ ঘোষ প্রমুখ স্বনামধন্য গল্পকারদের ছোটগল্পে যেভাবে প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাদের সঙ্গে মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পের সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য কতদূর তা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

সবশেষের অধ্যায়টির নাম উপসংহার। এই অধ্যায়ে একশ বছরের সময়সীমায় বিধৃত লেখিকাদের বাংলা গল্পে প্রতিবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের স্থান কতটা এবং তাঁরা ছোটগল্পে কোন অভিনবত্ব রেখে যেতে পেরেছেন কিনা ও শিল্পরূপের বিচারে গল্পগুলি কতটা রসোত্তীর্ণ এবং তাঁরা গল্পরচনার সময় অন্যান্য সাহিত্যিকদের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন তার যথাযথ মূল্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

গবেষণার কাজ করতে গিয়ে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো করেছি। গল্পকারদের গল্পের বহু লাইন দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছি। বলাবাহুল্য উল্লেখপঞ্জীতে সেগুলোর সবটা তুলে ধরে ভারাক্রান্ত করিনি। অনুরাগী পাঠকগণ গল্পগুলি পাঠ করে অতি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন।

পরিশেষে বলতে হয়, উপরিউক্ত বিষয় অবলম্বনে খন্ডিত ও বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে এই গবেষণা প্রকল্পটি বিশেষ মাত্রা এনে দেবে আশা করি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গবেষণার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে বিশ্বাস করি। অনালোকিত এই দিকটি নিয়ে গবেষণা কর্মটি একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আমার প্রত্যাশা।